।। উপসংহার ।।

মধ্যযুগের কাব্য পরিক্রমা করে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হল। সাহিত্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকা মানব সমাজ ও মানব মনের ইতিহাসের ধূলাচ্ছন্ন পাতার অন্তরাল থেকে আমরা বার করে নেবার চেষ্টা করেছি নারীর আসন। মানব সভ্যতার বিকাশ ও ক্রমোন্নতির গতিপথে একটি চিরন্তন সত্য এতে ধরা পড়েছে — তা হল শোষণ। সবল দুর্বলকে আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে এসে দুর্বলের কর্ম-ক্ষমতা ও সৃজন ক্ষমতাকে নিজ স্বাচ্ছন্দের জন্য শুষে নিয়ে ভোগ ও আরাম করেছে। দুর্বল সবলের ঐ সর্বগ্রাসী ক্ষমতার কাছে আত্ম সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। প্রতিবাদের ভাষা যেখানে মূক, শক্তি যেখানে ক্লীব সেখানে এসেছে এক কাল্পনিক অশরীরী দেবতা বা ভগবান। এই দেবতা বা ভগবান প্রকৃতপক্ষে সবলের হাতের শিখন্ডী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে যে ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি যদি কোন-দিন তার সামনে শিখন্ডীকে দেখেন তবে অস্ত্র ত্যাগ করবেন। এই কথা প্রতিপক্ষের জানা ছিল। মহাশক্তিধর ভীষ্ম যখন সেনাপতিত্ব দিয়ে কৌরব পক্ষকে নিশ্চিত জয়ের সীমানায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছিলেন তখন তাঁর সামনে এনে দাঁড় করানো হল শিখন্ডীকে। আর সত্যব্রত ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করলে তাঁকে নিরস্ত্র অবস্থায় বধ করা হল। দুর্বল যখনই

প্রতিবাদ করেছে বা সবল শক্তির সঙেগ পাল্লা দিয়ে জয়লাভ করার সামর্থ অর্জন করেছে তখনই দেবতা , বিধাতা , ভগবান , ভাগ্য প্রভৃতি প্রবঞ্চনার শিখন্ডী উদিত হয়ে ন্যায্য অধিকার আদায়ের তীব্র প্রচেষ্টাকে স্তিমিত করা হয়েছে । সবলের সৃষ্ট নীতি মালার মন্ত্র পাঠ করে দুর্বলকে বলা হয়েছে 'এ তোমার অনধিকার চর্চা'। আর যুগ যুগ ধরে শোষিত ও নির্যাতিত মানসিকতা তখন হাহাকার করেও স্বীকার করে নিয়েছে বিধির বিধানকে ভাগ্য বা আপন কর্মফল বলে ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর তথা আনবিক অস্ত্রের ধ্বংস ক্ষমতা লক্ষ্য করার পর শোষক ও শোষিত উভয় প্রকার মানব মনের গতানুগতিক চিন্তাধারায় এসেছে এক দ্বন্দ্ব । এসেছে নতুন ধরণের এক ভীতি । দেবতা , ভগবান বা বিধির ভীতি পার হয়ে এসেছে মানুষ । একবিংশ শতকের দ্বারদেশে এসে মানুষ আজ ভয় করছে মানুষকেই আর মানুষের তৈরি অস্ত্রকে । তাই মানুষ মানুষের জন্য কিছু করতে পারে কিনা এ ভাবনা প্রকট হয়ে উঠেছে ক্রমশ । কাউকে উপেক্ষা করে কেউই আজ আর চলতে চাইছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা মধ্যযুগের পটভূমিকায় নারীর স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি । মধ্যযুগের ঐতিহাসিক , আর্থ সামাজিক ও শাস্ত্র - পুরাণাদি শাসিত সমাজ ব্যবস্থা নরনারীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করেছে । আধুনিক মানবিক মূল্যবোধ সেকালে ছিল অনুপস্থিত । বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে আমরা যে মানবিক মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে

আমাদের নরনারীর সম্পর্ক রচনা করতে চাইছি সে মানসিকতার প্রত্যাশা মধ্যযুগে রচনা করা যায় না । জৈবিক প্রয়োজনের ঊর্দ্ধে যে নরনারীর একটা সম্পর্ক আজকের প্রত্যাশা সেদিন তার আশা আমরা করতে পারিনি।

যতই প্রাচীনতা বা সাংস্কৃতিক কৌলীন্যের বড়াই করিনা কেন আমাদের সংস্কৃতির প্রাগৈতিহাসিক কল্পিত স্বর্গলোক থেকে আমরা বিচ্যুত হয়েছিলাম । কতকগুলি অন্ধ কুসংস্কারের আবর্জনা স্তূপে চাপা পড়ে গিয়েছিল আমাদের ঐতিহ্য । প্রাচীন যুগের সমাজ ব্যবস্থা মধ্যযুগে এসে একটা অচলাবস্থার মধ্যে দীর্ঘদিন আবদ্ধ হয়েছিল । পাশ্চাত্তের যান্ত্রিক বিপ্লব , কৃষি বিপ্লব , শিল্প বিপ্লব ও রাজনৈতিক বিপ্লব ও তজ্জাত যুক্তি-নির্ভর জীবন জিজ্ঞাসার ঢেউ আমাদের দেশে এসে পড়েছিল বলেই এদেশে আজ বিশ্বের দরবারে আপন আসন করে নিতে পেরেছে । কাজেই আধুনিক পৃথিবীর অন্যতম দেশ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য আমরা পাশ্চাত্তের নিকট ঋণী । এই এক শতাব্দী ব্যাপী মানসিক অভ্যুদয় আমাদের চিন্তাধারায় যে বিবর্তন এনেছে সেই বিবর্তিত মানসিক প্রেক্ষিতে মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থায় নরনারীর জীবন যাপন পরিক্রমায় পারস্পরিক সম্পর্ক ও অবস্থান নির্ণয় করতে আমরা নবমূল্যায়ণের যে প্রচেষ্টা চালিয়েছি তার সম্পর্কে একটি সাধারণ আলোচনা করা যেতে পারে ।

১। ত্রয়োদশ শতকের সূচনা থেকে পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্যন্ত

বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাস ক্ষণস্থায়ী শাসককুলের উত্থান পতনের ইতিহাস। এই দুই শতাব্দী ধরে বাঙালীর উপর চলেছিল আর্যীর ওমরাহদের স্বৈরাচারী নিপীড়ন ও শোষণ। তুর্কী, পাঠান মোগল আক্রমণ ও শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাঙলার সমাজ জীবনে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিলনে যে মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছিল তার ফলে সংস্কৃত শাস্ত্রানুমোদিত নৈতিকতা বোধ ও পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী আর্য জীবন যাপন প্রণালীকে পাশ কাটিয়ে স্বকীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন পরমত সহিষ্ণু পাল রাজাদের আমলে তারা বেশ ভালই ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির গোড়া সমর্থক সেন রাজাদের আমলে তারা সামাজিক নির্যাতনের শিকার হয়ে যন্ত্রণা ভোগ করেন এবং পাঠান মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এই জন গোষ্ঠীর অনেকেই ধর্মান্তরিত হয়ে আত্মরক্ষার পথ বেছে নেন।

সংস্কৃত মহাভারতের যে বঙ্গানুবাদ কাশীরাম দাস করেন তা প্রকৃত পক্ষে আক্ষরিক অনুবাদ নয়। ভাবানুবাদ। এই গ্রন্থে প্রতিফলিত হয় মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার একটা শীর্ণ স্রোত। অম্বিকা, অম্বালিকা ও দাসীর গর্ভধান, কুন্তীর কুমারী মাতৃত্ব ও কর্ণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ যদিও কিছুটা মাতৃতান্ত্রিকতার ছাপ বহন করে তবুও আমাদের আলোচ্য যুগে পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থাই দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। এযুগের সমাজ জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর প্রমুখ স্মৃতিকার -

দের অনুশাসন । মনুর 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি' ছিল এযুগের নিয়ন্ত্রাবাণী। মনুর মতে স্ত্রী জাতির স্বাধীনতা বা স্বকীয় চিন্তা ভাবনার বিকাশ নিষিদ্ধ । নারী চলতে বাধ্য থাকবে পুরুষের ইচ্ছায় । অন্ত:পুর তাদের একমাত্র বাসস্হান । পুরুষের সন্তান ধারণ , পালন ও রন্ধনাদি দ্বারা পুরুষের সেবাই নারীর একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য । যে পাঠান মোঘল শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে উচ্চবর্ণ দ্বারা নির্যাতিত অনার্য নামধেয় সমাজের মানুষ ধর্মান্তর গ্রহণ করে আত্মরক্ষার পথ খুঁজেছিল সেই ইসলাম প্রবর্ত্তিত সমাজ ব্যবস্হায় নারীর স্হান আরও একধাপ নীচে বলে মনে হয় । কারণ এই সমাজ ব্যবস্হায় গৃহের বাইরে নারীর আঁপন মুখও অপর পুরুষের সম্মুখে উন্মোচিত করে চলাচল করা নিষিদ্ধ । বোরখা পরিহিত হয়ে সূর্যা - লোকিত রাজপথে চলতে হতো ।

উপরোক্ত বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজে শিল্পী সাহিত্যিকেরাও স্বচ্ছন্দভাবে নি:শ্বাস ফেলে তাদের শিল্পী মনের সাহিত্যিক প্রকাশ করতে পারতেন না । এক কথায় এক বিদগ্ধ দার্শনিকের মন্তব্যানুযায়ী বলতে হয় সমাজ জীবন যেন রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর যক্ষপুরীর বোবা শ্রমিকের জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়ে চলছিল । নারীই ছিল এই উপেক্ষা ও নির্যাতনের অন্যতম শিকার । বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে আমরা নির্যাতীতা , অবহেলিতা নারীর প্রতিনিধি স্হানীয়া একদেবী ও এক মানবীর সাক্ষাৎ পাই । তাঁরা হলেন দেবী মনসা ও মানবী বেহুলা ।

অবহেলা , উপেক্ষা , নির্যাতন মনসাকে করেছে নিষ্ঠুরা ও প্রতিহিংসা পরায়ণা । পূজা আদায় করার জন্য দেবী মনসা চাঁদ সওদাগরের চরম সর্বনাশ সাধন করেছেন । কিন্তু তাতে সওদাগরের পৌরুষ ও নারীর প্রতি ঘৃণা কমেনি । একজন সমাজপতির মুখের কথা —

যে হাতে পূজেছি আমি দেবশূল পাণি ।
সে হাতে পূজিব পুনি চেংমুরি কানী ।।

বেহুলা নারীদেহ ভোগলোলুপ বহু পুরুষের উদ্ধত প্রস্তাব উপেক্ষা করে নিজ স্বামীর জীবন ফিরিয়ে এনেছে । দেবতাদের সম্মুখে নৃত্যরতা বেহুলাকে দেখে পুনর্জীবন প্রাপ্ত লক্ষীন্দরের উক্তি প্রমাণ করে নারী ন্যূনতম সামাজিক মর্যাদার বদলে লাভ করেছে পুরুষের সন্দিগ্ধ ও হেয় দৃষ্টিভঙ্গী ।

লখাই বোলে সুন বালা কুলে লাগাইলি কালি
তোমার কেনে এমতি বেভার ।
এতেক সমাজ মাঝে নৃত্যকর কোন লাজে
ত্রিভুবনে রাখিলে খাথার ।। (পৃ:- ৪৮৩)

কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়ক ধনপতি সদাগরও বলেছেন —

'স্ত্রীলিঙগ দেবতা আমি পূজা নাহি করি ।' (পৃ:- ১৯৩)

২। রাজধানী দিল্লীর সিংহাসনে বসে সম্রাট ভারত শাসন করছেন। দেশের দূরবর্তী প্রান্তের শাসন ব্যবস্থা তাই নির্ভরশীল ছিল সামন্ত প্রথার উপর। রাজা, জমিদার বা সৈনাধ্যক্ষ প্রভৃতি প্রতিনিধির মাধ্যমে চলত বাঙলার মত এক প্রত্যন্ত দেশের শাসন। মূলত এই সামন্তরা ছিলেন দিল্লীর শাসনকর্তার আস্থাভাজন ও আঞ্চলিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। দিল্লী এদের কাছে নিয়মিত অর্থ ও রকমারি উপঢৌকনাদি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। যদি কখনও কোন সামন্ত এই নিয়ম পালনে গড়িমসি করতেন বা উপেক্ষা প্রদর্শন করতেন তবে তার বিরুদ্ধে দিল্লী কোন সৈনাধ্যক্ষ প্রেরণ করে তাকে সাজা দেবার ব্যবস্থা করতেন। অধিকতর ক্ষমতাশালী সামন্তরা বিজয়ী হলে নতুন সন্ধি স্থাপন করে আর পরাজিত হলে অন্যকোন অনুগত সামন্তকে বিদ্রোহীর স্থলাভিষিক্ত করে দিল্লী তার আর্থ সামাজিক শাসন দন্ড রক্ষা করে চলতেন। এই প্রথাকেই মোটা মুটি সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বলা চলে।

এই রকম একটা চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার কাছে রাষ্ট্রনৈতিক ভাবে সমাজ জীবনে কোন পরিবর্তন বা সংস্কার প্রত্যাশা করা যায় না। ক্ষমতাসীন সামন্তরাজ ও তাদের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের তুষ্ট করে পুরুষ সমাজ তাদের গার্হস্থ্য জীবনের রুজি রোজগার পরিচালনা করেছেন। আর পূর্ববর্তী আলোচনাংশে প্রকাশিত শাস্ত্রপুরাণাদির নৈতিক অনুশাসন মেনেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নরনারীর জীবন পরি -

চালিত হত। আর বহিরাগত সামন্তরা রাজকর্মচারীর মত বাঙলায় কিছুদিন চাকুরী করে প্রচুর ধনসম্পত্তি নিয়ে দিল্লী আগ্রায় ফিরে যেতেন। বাঙলার সঙ্গে এই সব সামন্তদের শাসন ও শোষণ কার্য ছাড়া অন্য কোন সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অস্থিরতা ও হিন্দু সমাজের উপর ইসলাম সংস্কৃতির আক্রমণ বাঙলার জনজীবনের ইতিহাসের এক করুণ কাহিনীমাত্র। এই আঘাত হজম করে যাতে হিন্দু সংস্কৃতি আত্মরক্ষা করতে পারে সেজন্য পঞ্চদশ শতকে শূলপাণি, শ্রীকর আচার্য ও আচার্য চূড়ামণি প্রমুখ স্মৃতিকারেরা কিছু স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করে সমাজকে বেঁধে রাখার প্রয়াস করেছিলেন। কিন্তু এই সব গ্রন্থে ব্রাহ্মণের স্তুতি, নারী নির্যাতনের প্রয়াস ও শূদ্রনিন্দার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

স্বৈরাচারী সামন্তরা যাদের মাধ্যমে কর সংগ্রহ করতেন তারা ততোধিক উৎপীড়ক ছিলেন। তারা শুধু রাজস্বই সংগ্রহ করতেন না। নারী সংগ্রহ করে নারীরত্ন উপঢৌকন দিয়ে নিজেদের লুণ্ঠন, ধর্ষণ, নিপীড়ন ও পণ্যসামগ্রীর মত ধর্ষিতা নারী বিক্রয়ের দ্বারা সম্পদ সৃষ্টির কাজকে বাঁচিয়ে রাখার পাকাপাকি বন্দোবস্তকে অক্ষুন্ন রাখতে চেষ্টা করতেন।

বিদেশী পর্যটক মানরিকের বিবরণ এই চিত্রটি সুন্দর করে তুলে ধরেছে — 'খাজনার টাকা দিতে না পারলে হিন্দুদের স্ত্রী ও সন্তানদের

নিলামে বিক্রয় করা হত। কর্মচারীরা কৃষকদের নারী ধর্ষণ করতো এবং পিয়াদারা নানা প্রকার উৎপীড়ন করতো — এর কোন প্রতিকার ছিল না। .....'

বল্লাল সেনের কৌলীন্য প্রথা সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে নারীর ব্যক্তিসত্তার কোন মূল্যই ছিল না। সমসাময়িক কাব্য সমূহে তার স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। মলুয়াকে কাজী দেওয়ানের কাছে উপঢৌকন হিসেবে পাঠালো। সমাজ তাকে রক্ষা করতে পারলো না। মলুয়া আপন সতীত্ব রক্ষা করে দেওয়ানের দ্বারা কাজীর-শাস্তি বিধান করে অক্ষত দেহে দেওয়ানের হারেম থেকে বেরিয়ে এলো তার তীক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ততা ও সুনিপুণ অভিনয় কৌশল দ্বারা। স্বামী চাঁদ বিনোদের অবস্থার পরি-বর্তন এনে দিল মলুয়া। কিন্তু যেহেতু দেওয়ানের গৃহে রাত্রিবাস করেছে সেহেতু এই বীরাঙ্গনা নারী আর দাম্পত্য জীবন যাপনের সুযোগ পেলনা সমাজপতিদের আপত্তির জন্য। মলুয়াকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়ে বিনোদকে নতুন করে বিয়ে করে সংসার করার ছাড়পত্র দিতে হল। মৈমনসিংহ গীতিকার এই চিত্রই কেবল নয় মঙ্গলকাব্যগুলিতেও এরূপ চিত্রের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়।

কৌলীন্য প্রথার ফলে একজন অপদার্থ কুলীন পুরুষ বহুবিবাহ করার অধিকার লাভ করেছিল। এজন্য বহু স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব সেই

পুরুষকে বহন করতে হত না । স্মৃতিশাস্ত্রগুলির বিধানে স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সঙেগ কথাবার্তা বলা , বেড়ানো ছিল ব্যভিচার । স্বামীর অনুপস্থিতিতে নারী প্রসাধনও করতে পারবে না । ব্যভিচার পরায়ণা স্ত্রীর শাস্তির বিধান আছে কিন্তু পরদেশে ভ্রমণকারী স্বামী যদি উপঢৌকন স্বরূপ কোন নারীরত্ন লাভ করে সঙেগ নিয়ে আসেন তবে প্রশ্ন ও দ্বিধাহীন চিত্তে সেই সপত্নীকে স্বীকার করে নিতে হবে নারীকে ।

এইরূপ সমাজ পরিবেশে রচিত বড়ুচন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের নায়ক কৃষ্ণ বলছেন — 'অবতার কৈল আম্মে তোর রতি আশে'। নারীদেহ সম্ভোগ লিপ্সু একটি পুরুষের এবংবিধ আচরণের জন্য কোন প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি কৌলীন্য প্রথা ও স্মৃতিকারদের বিধানেই । কবিও তাই কেবল চিত্র রচনা করেই এইরূপ চরিত্রের দেবত্ব প্রমাণ করে আইহণের স্ত্রী রাধাকে কৃষ্ণময়ী করে পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন ।

বৈষ্ণব সহজিয়া তান্ত্রিক দর্শন নারীকে ধর্ম সাধনের যন্ত্রহিসাবে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে প্রকারান্তরে নারীদেহ ভোগাকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে দিয়েছে ।

যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সৈন্যদের দ্বারা নারীজাতির অপমানের সীমা থাকে না । 'মহারিস্তান-ই-প্রায়েরি' গ্রন্থে গ্রন্থকার সেনানায়ক লিখে-

ছেন যে তার সৈন্যেরা চার হাজার স্ত্রীলোককে বন্দী করে এনে সবাইকে বিবস্ত্র করে রেখেছিল। সংবাদ পেয়ে তাদের মুক্তি দেবার সময় পাজামা, বিছানার চাদর, আলোয়ান প্রভৃতি দ্বারা কোন মতে লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা করে তাদের ঘরে পাঠানো হয়েছিল।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার আর একটি ফসল সতীদাহ প্রথা। সামন্তরাজারা সামাজিক প্রথাগুলির সুফল কুফল নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তাদের একমাত্র চেষ্টা ছিল দিল্লীর সিংহাসনকে তুষ্ট রেখে নিজেদের সম্পদকে যথাসাধ্য বাড়িয়ে তোলা, তাদের সমস্ত-শক্তি ও চিন্তাই নিয়োজিত ছিল একটা বাণিজ্যিক কায়দায়। শাসনযন্ত্র যখন সমাজ জীবন সম্পর্কে একটা চরম উদাসীনতা নিয়ে চলে তখন সমাজ-জীবনের মধ্যে একটা মাৎস্য ন্যায় সৃষ্টির আবহাওয়া রচিত হওয়াই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। শক্তিশালী রাজশক্তির কাছে অবনত মস্তক পুরুষ সমাজ তখন দুর্বলতর নারী সমাজের উপর স্বীয় নির্যাতনের বদলা নেবার মানসিক প্রবণতায় মেতে ওঠে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই প্রবণতায় তথাকথিত শাস্ত্রজ্ঞ সমাজপতিরাও স্বীয় হীনমন্যতা বোধ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। কোন পুরুষের স্ত্রী মারা গেলে পুনরায় কোন কুমারী কন্যাকে বিবাহ করে সসম্মানে সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু কৌলীন্য প্রথা সিদ্ধ কোন বৃদ্ধ যদি তরুণী ভার্যা রেখে শ্মশান যাত্রা করতেন তখন সেই তরুণীকে ধর্মীয় প্রেরণা দিয়ে সতী

হবার আছিলায় তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হত। এই বর্বর প্রথা সমাজ মনে এমন ভাবে গেড়ে বসেছিল যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাম-মোহন, বিদ্যাসাগরের নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রভূত বিরোধিতা দানা বেঁধে উঠেছিল। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে একবিংশতি শতাব্দীর প্রবেশ-দ্বারে পৌঁছেও ১৯৮৭ তে রাজস্থানে রূপকানোয়ার নামে এক তরুণীকে সতী করা হয়েছে তার স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মেরে। মধ্যযুগীয় বর্বর প্রথার এই আকস্মিক প্রকাশ এবং সেই সতীর শ্মশানে স্মৃতি বেদী স্থাপনের পৈশাচিক পৌরুষ এযুগের মানুষও যখন দেখাতে পারছে তখন স্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহ জাগে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এখনও সম্ভব হয়ে উঠেছে কিনা। এর মূলেও রয়েছে ঐ সামন্ততান্ত্রিক মানসিক প্রবণতা।

৩। স্মৃতিশাস্ত্রকারদের নির্ধারণ মেনে চলতে গিয়ে নারীকে নানা-ভাবে বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে। স্বামীর সম্পত্তিতে তার কেবল খেয়ে বেঁচে থাকার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু সম্পত্তি হস্তান্তরের কোন অধিকার সে পায়নি। মনুসংহিতার একটি উদ্ধৃতি এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

নাস্তি স্ত্রীনাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্ম্মে ব্যবস্থিতি:।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতি স্থিতি:।। (৯.১৮)

অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী নারীজাতির কোন কর্মই শাস্ত্রের

বিধি অনুযায়ী মন্ত্রদ্বারা নিষ্পন্ন হয় না । এরা শ্রুতি ও স্মৃতিহীনা তাই ধর্মজ্ঞ হতে পারে না । পাপ করলে মন্ত্রের সাহায্যে এদের পাপের স্খালন হয় না । নারী মিথ্যার মতই অশুচি ।

এইরূপ বহু উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে নারী জাতির প্রতি স্মৃতিকারগণের এই দৃষ্টি ভঙ্গীই মধ্যযুগের নারী জীবনকে পরিচালিত করেছে । ফলে শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণও নারীর পক্ষে অপরাধ বলে গন্য হয়েছে । জ্ঞানহীন মানুষ পশুর সমান । জ্ঞানহীনা নারীকুল তাই গৃহপালিত পশুর মতই পুরুষের নিয়ন্ত্রণে, উপভোগে নির্যাতনে ও বঞ্চনায় যুগের পর যুগ ধরে জীবন ধারণ করে এসেছে । সমাজের সবলতর ও পরিচালক অঙ্গ পুরুষের সমমর্যাদা লাভের স্বপ্নও মধ্যযুগের নারীর কাছে অলীক ছিল ।

স্ত্রীজাতি প্রজাসৃষ্টির উপাদান । অর্থাৎ শ্রমিককে জন্ম দিয়ে লালন পালন করে সমাজের চাকাটাকেই সচল রাখাই নারীর অন্যতম কাজ । আর এই যূপকাষ্ঠের মধ্যে গলা দিয়ে যারা জীবন যাপন করতে বাধ্য ছিল তাদের পক্ষে কেবলমাত্র দেহ কেন্দ্রিক হওয়াই স্বাভাবিক । তাই মধ্যযুগের সাহিত্যে যুবতী নারী দেখা মাত্রই পুরুষের প্রস্তাব এসেছে 'রতি আশা' করে । শিব চরিত্র অঙ্কনেও যেমন এই চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে আবার

বেহুলার মাত্রঃজমে করে মৃত স্বামীকে বাঁচাবার জন্য যাত্রার ঘাটে ঘাটে-ও বেহুলার কাছে এরূপ প্রস্তাবের ছড়াছড়ি। নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টি এমনই ছিল যে শিব যেমন তার নিজ কন্যা মনসার যৌবন দেখে ভোগা-কাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে তেমনি বেহুলার ভাই বানিজ্য করে ফেরার পথে বেহুলার পরিচয় ভাল করে না জেনে একইভাবে প্রস্তাব করেছে।

অপরপক্ষে কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে - সুন্দরের নগরে প্রবেশ কালের বর্ণনাও অনুরূপ। নারীকুল সুন্দরকে দেখে নিজ নিজ পতির সহবাস স্মৃতি মন্থন করেছে। নিজ নিজ স্বামীর অপদার্থতা তথা নিন্দা তাদের কণ্ঠে কবি দিয়েছেন সুললিত ভাষায়। আবার রমণীয় ভাষায় সুন্দরকে স্বামী হিসেবে পেলে তারা কত বেশি তৃপ্ত হতে পারত সে কথাও ফুটে উঠেছে। এই তালিকা থেকে কিশোরী থেকে বৃদ্ধা কেউই বাদ পড়েনি।

সেই ভাগ্যবতী এই যার পতি
সুখে ভুঞ্জে রতি মন আবেশে।
এ মুখ চুম্বন করয়ে যখন
না জানি তখন কি করে শেষে।। (বিদ্যাসুন্দর -ভারতচন্দ্র)

ভারতচন্দ্রের বিদ্যা পত্র লেখার মত শিক্ষিতা। কিন্তু তার পত্রখানিতে

কেবল একজন সুন্দর পুরুষের কাছে নিজদেহ সমর্পণের নির্লজ্জ প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নেই ।

এককথায় নারীর জীবনবৃত্ত যে চেতনার সঞ্চারচার সমগ্র মধ্যযুগে হয়েছিল তাতে নারী নিজেকে কেবল পুরুষের ভোগ্য পণ্য দ্রব্য বিশেষ হিসেবেই মেনে নিয়েছিল । দ্বিতীয়ত: নারী তার জীবনের সমস্ত পরিণতির জন্য মানব সমাজে তার অন্যতম প্রতিপক্ষ পুরুষকে দায়ী করার শিক্ষা বা মানসিকতা লাভ করেনি । তার সমস্ত পরিণতির জন্য হয় ভাগ্যকে নতুবা পূর্বজন্মের কৃতকর্মকে দায়ী করে চোখের জলের গঙগা বইয়ে দিয়ে বেদনামুক্ত হতে চেয়েছে ।

এই মানসিকতার কারণ হিসাবে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে নারী জীবনের বেদনাময় মুহূর্তগুলোকে সে সমাজের কারও কাছ থেকে সহানুভূতি পায়নি । মধ্যযুগের সাহিত্যে এই চিত্রের যতগুলি প্রতিফলন ঘটেছে সেগুলি বিশ্লেষণ করলে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে ।

কবিকঙকণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীমঙগলকাব্যের নায়িকা গৌরী বলছে —

ময়ূর-মুষায় দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্বী সদাই কন্দল ।
ওই নিমিত্তে সদাগালি মোর কর্মফল ।।
দারুণ দৈবের ফলে হইনু দু:খিনী
ভিক্ষার ভাতে দারুণ বিধি করিল গৃহিনী ।। (পৃ:-১১৯)

অপর নায়িকা ফুল্লরা বলছে —

বিধাতা আমারে দন্ডী জীয়ন্ত স্বামীতে রান্ডী
কৈল দৈব দু:খের ভাজন ।।

মনসামঙগলের বেহুলার উক্তি —

এত দু:খে রান্ধিনু ব্যঞ্জন আর ভাত
অভাগিনীর কর্মদোষে পড়িলা নিদ্রাত ।। (পৃ:-৩২৮)

* * * *

কোথা গেলে পাইব প্রাণে রতন নিধি ।
পূর্ব জন্মের পাপে বিড়ম্বিল আমায় বিধি ।। (পৃ:-৩৬৯)

এই প্রকার বহু উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায় নারীর জীবনে যখনই দুর্যোগ নেমে এসেছে তখনই তার প্রতি কোন পুরুষ তো দূরের কথা -কোন নারীও সমবেদনা বা সহানুভূতি জানাতে বা তার পক্ষ সমর্থন করতে এগিয়ে আসেনি।

পরন্তু সবাই সমবেত কণ্ঠে সেই নারীকে নিন্দা করেছে আর তার প্রতি সামাজিক নিপীড়নের চাপকে শতগুনে বর্দ্ধিত করতে সাহায্যই করেছে। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের নায়িকা রাধার জীবনে শ্রীকৃষ্ণের বলিষ্ঠ আবির্ভাবের সহায়িকা বড়াই। রাধার প্রতিবাদের সমর্থন সে তার অভিভাবিকা বড়াই-এর কাছে পায়নি। আবার কৃষ্ণময়ী রাধা যখন কৃষ্ণের জন্য অধীরা তখন কৃষ্ণের সুরে সুর মিলিয়ে বড়াই-ও রাধাকে তার নিজ কর্মদোষের জন্য বিদ্রূপ করেছে। আর রাধা বলেছে তার সমস্ত পরিণতি নিশ্চয়ই তার পূর্বজন্মের কোন খন্ড ব্রতেরই ফল। মনসামঙ্গলকাব্যের নায়িকা বেহুলাও পুরুষ বা নারী কোন মানুষের কাছে সহানুভূতি পায়নি। পেয়েছে নিন্দা তার বৈধব্যের জন্য - যে বৈধব্য তার নিজের কোন অপরাধের ফলশ্রুতি নয়। মনসা যখন শিবের সঙ্গে বাড়ীতে এসেছে তখন নিজ পরিচয় দেবার বা আত্মপক্ষ সমর্থন করে শিব যে তার পিতা একথা বোঝাবার সুযোগ পায়নি তার মাতৃস্থানীয়া শিবের দুই পত্নীর কাছে। পরন্তু এতই প্রহৃত হয়েছে যে তার একটা চোখ পর্যন্ত হারাতে হয়েছে, কাঁকালের হাড়ও গেছে ভেঙে। তাদের স্বামী শিব চরিত্রহীন একথা তারা জানতো। কিন্তু সেজন্য শিবকে নিন্দা করার বদলে কল্পিত তৃতীয় সপত্নী মনে করে কন্যা সাদৃশ্যা মনসাকে প্রহার করেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মানবিক মূল্য কমে যায়, মানুষ স্বার্থপর, স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে এবং দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার চরমে উঠে যায়। মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রতিফলিত অসহায় নারী এমনি এক দুর্বলতর সামাজিক অঙ্গ। একদিকে

স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অপরদিকে সমাজ ব্যবস্থার কুফল মধ্যযুগে নারীর জীবনে মানবিক ও মানসিক বিকাশ লাভের পথে পর্বত প্রমাণ বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ।

৪। মধ্যযুগের সাহিত্য সম্ভার যে সব কাব্য দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে তাদের বেশির ভাগই ধর্মীয় প্রেরণামূলক ও দেবমাহাত্ম্য প্রকাশ মূলক । কেবলমাত্র রোসাঙ রাজসভাকে কেন্দ্র করে কতিপয় মুসলমান কবির রচনা এবং মৈমনসিংহ গীতিকা নামে পরিচিত পূর্ববঙ্গের লোকগাঁথার সংগ্রহে নরনারীর প্রণয়মূলক রচনার সাক্ষাৎ মেলে । দেবমাহাত্ম্য প্রচার মূলক কাব্য সমূহের আপাত উদ্দেশ্য কোন শাপ ভ্রষ্ঠা দেবীর মর্তে আগমন ও মানব মানবীর নিকট পূজা আদায় করা । লক্ষ্যণীয় যে একমাত্র ধর্মমঙ্গল , শিবায়ন , শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা শ্রীকৃষ্ণবিজয়, চৈতন্যমঙ্গল প্রমূখ কাব্যসমূহে পুরুষ দেবতাদের প্রতিষ্ঠা মূলক কাব্য সমূহে সংশ্লিষ্ট দেবতা-গণের প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে হয়নি । বলা চলে এই পুরুষ-দেবতাদের মঙ্গল গীত হয়েছে প্রতিষ্ঠিত দেবতা হিসেবে । ব্যতিক্রম কেবল 'স্ত্রীলিঙ্গ' দেবতাদের নিয়ে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলি । এই দেবীর মধ্যে আমরা মনসা ও চন্ডীর নাম উল্লেখ করতে চাই । মনসার ~~**~~ পূজা করতে অনিচ্ছুক চাঁদ সওদাগরকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলতে শুনি যে হাতে তিনি দেবশূলপাণীর পূজা করেছেন সে হাতে চেঙমুড়ি কানীর পূজা করতে পারবেন না । আর চন্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগর

আরও এক পা এগিয়ে স্পষ্টই বলেছেন - 'স্ত্রীলিঙগ দেবতা আমি পূজা নাহি করি ।'

এই যুগের কাব্যে নারীর অবস্থার প্রতিফলন খুঁজতে গিয়ে আমাদের আর একটি দিক লক্ষ্য করার সুযোগ হয়েছে । সে দিকটা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার একটা যেন উষালগ্ন । তান্ত্রিক সাধনার পীঠস্থান তথা পুরুষ-দেবতার আরাধনায় অভ্যস্ত বাঙলাদেশে দেবশূলপাণীর পাশাপাশি মনসা বা চন্ডী নামের নারী দেবতার বিজয়াভিযান । নির্যাতন, উপেক্ষা, বঞ্চনা, ও মর্যাদাহানির গ্লানি মনসাকে করেছে প্রতিহিংসা পরায়ণা । এক হিসেবে মনসা হচ্ছেন বহুযুগের নিপীড়িতা নারী আত্মার প্রতিনিধি স্থানীয়া । পুরুষ প্রধান ও পুরুষের স্বার্থরক্ষার জন্য রচিত শাস্ত্রপুরাণ ও স্মৃতি গ্রন্থাবলীর অনুশাসনে পরিচালিত মানব সমাজে নারীর কোন মানবিক অধিকারই স্বীকৃত ছিল না । সেই সমাজে শিবের ঔরসজাত সন্তান হয়েও মনসাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করতে গিয়ে যে সব বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সে সব বাধা সে অতিক্রম করেছে দৈবশক্তির অধিকারী বলে । বেহুলার জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতার অবসান ও ঘটেছে দেবী মনসার পরোক্ষ অথচ নিরবচ্ছিন্ন সহায়তার ফলে । এমনি করে বিভিন্ন কাব্য বিশ্লেষণ করে আমরা একটা সিদ্ধান্তে এসেছি । যে যুগে ন্যায্য অধিকার আদায় করে নেবার জন্য কোন সঙঘবদ্ধ মানবলোকের আন্দোলন গড়ে তোলার মানসিকতার খোঁজ মানুষ পায়নি সে যুগের কবি তার কাব্যের

পাত্রপাত্রীর জীবনের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য দৈববলের উপর নির্ভর করেছেন। এই দৈবনির্ভরশীলতাই মধ্যযুগের মানুষের ছিল একমাত্র অবলম্বন। সমাজ ব্যবস্থায় যখন শাসক ও শোষক শ্রেণীর হাতেই সমস্ত স্তরের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে তখনই মানুষকে পূর্বজন্মের কর্মফল বা বিধিলিপি মেনে নিতে শিক্ষা দেয় সমসাময়িক সমাজের শাস্ত্র পুরাণাদির শিল্পীবৃন্দ। আর এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বসে কাব্যরচনাকারী শিল্পীবৃন্দও সেই শাস্ত্রীয় ও সামাজিক তত্ত্বকেই কাব্যে মূর্ত করে থাকেন। মধ্যযুগেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। নারীচিত্র চিত্রণে কবিদের যদি কিছু স্বকীয়তা বা সহানুভূতি বোধ জাগ্রত হয়েও থাকে তবুও সে জাগরণ খন্ডিত বা গন্ডীবদ্ধ হয়েছে। কবিরা সমাজ জীবনের উর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নারীজীবন সমীক্ষা করার অবকাশ পাননি বা সে রকম চেষ্টা করতে পারেন নি।

তাই আমাদের বিচারে বীরাঙগনা বেহুলা শ্বশুরকুলের সমস্ত সম্পদ উদ্ধার করে এলো আপন নারী জীবনের তথাকথিত শ্রেষ্ঠ সম্পদ স্বামীর জীবনসহ। তখনও কবি গতানুগতিকতাকে পাশ কাটিয়ে একটা বিজয় মুকুট পড়িয়ে দিতে পারলেন না বেহুলার শিরে। সেই রামায়ণে সীতার সতীত্বের পরীক্ষার পুনরাবর্তন। মৃতস্বামীকে নিয়ে একা বেহুলাকে নিয়ে কবি দেবলোক পরিক্রমা সেরে তার মানসী বেহুলাকে নিয়ে এলেন বিজয়িনী করে। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় এই নারীর জন্য কবি প্রথমেই তার পুনরুজ্জীবিত স্বামীর কণ্ঠে দিলেন সন্দেহের সুর। যে

নারী দেবতা মনসার অনুগ্রহে চাঁদসদাগরের সৌভাগ্যের অস্তমিত চন্দ্রের পুনরভ্যুত্থান সম্ভব হল সেই দেবীর প্রতি সসম্ভ্রম শ্রদ্ধার বদলে পুরুষ সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় চাঁদ পুত্রবধূ অনুরোধে পিছন ঘুরে দিলেন ফুল জল তাও বাঁ হাতে। কবি এখানে ব্যক্তি নিরপেক্ষ কাব্যমালিকার মালাকারের ভূমিকাই কেবল পালন করলেন।

এই মাৎস্য ন্যায়ের যুগের আপাত ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের মত স্ফুলিঙ্গের আলো কোথাও লক্ষ্য করা যায়নি তা নয়। সনকা যখন বেহুলাকে দায়ী করেছে তার পুত্রের মৃত্যুর জন্য তখন বেহুলাকে বলতে শুনি অন্য ছয়পুত্র যে তার শাশুড়ীর মারা গেছেন তারাও কি তারই জন্য। ফুল্লরা সুন্দরী নারীরূপী চণ্ডীকে বলছে সতীনের সঙ্গে দ্বিগুণ ঝগড়া করে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে। বলছে সেজন্য গৃহত্যাগ করা বা আত্মহত্যা করা ঠিক নয়। কিন্তু এই বাদানুবাদ হয়েছে নারীতে নারীতে। বেহুলা স্বামীর কাপুরুষের মত কথার প্রতিবাদ করে নি, সনকার বা খুল্লনার দেবীপূজার মঙ্গলঘট যখন তাদের স্বামী পদাঘাতে চূর্ণ করেছে তখন সেই নারীদেবতা তথানারী বিদ্বেষী স্বামীর সামনে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কোন তেজ দেখায় নি। অশ্রুজলে দেবীরই নিকট স্বামীর কল্যাণ কামনায় রয়েছে। যে ফুল্লরা সতীনের ঘর করার সম্ভাবনায় ভীতা হয়ে নারীরূপী দেবীকে তার গৃহ থেকে চলে যাবার জন্য অনুরোধ করছে তখন একটি বারের জন্যও তার স্বামীর তথা পুরুষের বিরুদ্ধে কটূক্তি করেনি। কেবল কলিপত

বারমাসী দারিদ্র দুঃখ দুর্দশার জন্য নিজ কর্মদোষ ও পূর্বজন্মের কর্মফলের বা বিধিলিপিকে দায়ী করেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নায়িকার প্রাথমিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ চিত্রিত হয়েছে তাম্বুলখণ্ডে। যখন সে বড়ায়িকে চপেটাঘাত করে দেহভোগাকাঙ্ক্ষার আমন্ত্রণ মূলক কৃষ্ণ প্রেরিত তাম্বুলকে পদদলিত করেছে তখন যেন মনে হয়েছে রাধার নারী সত্তা প্রতিবাদ মুখর। কিন্তু অসহায়া রাধা তার দৈহিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য সমাজ ও পরিবেশ থেকে কোন সাহায্য, প্রেরণা বা সমর্থন পায়নি তখন তাকে পরিস্থিতির পরিণামে রূপান্তরিত হতে হয়েছে। আইহনের বিবাহিতা স্ত্রীর কৃষ্ণময়ী রাধায় রূপান্তর ও তজ্জনিত বৈষ্ণবীয় দর্শনানুগ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সঙ্গে তাঁর হলাদিনী শক্তির মিলন প্রভৃতি ধর্মীয় মহিমামণ্ডিত মধুর রসের স্বাদ আলাদা। আমরা সেই তত্ত্বের আলোচনায় যেতে চাই না। আমরা এই পরিণতিকে সোজা কথায় বুঝতে চাই। ধর্মীয় বা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী যে বা যারা তাদের কাছে অসহায়ের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ও আত্মরক্ষার পথ সবদিক থেকেই তারা অবরুদ্ধ করে আপন শাসন ও শোষন চালিয়ে থাকেন। অসহায়ের সেখানে স্বাতন্ত্র্যবোধ বিসর্জন দিয়ে লীন হয়ে যাওয়া ছাড়া বেঁচে থাকার অধিকার থাকে না। বড়ু চন্ডীদাসের রাধা মধ্যযুগের অসহায় নারীচরিত্রের এমনি এক উদাহরণ।

মঙ্গলকাব্যের নারীরা যেখানে পতিনিন্দা করেছেন সেখানে একটা অদ্ভুত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কোন 'সুন্দর'কে বা 'বালা'কে দেখে

পর্দার আড়ালে বা জনশ্রুতিগোচর না করে আপন মনে পতিনিন্দা করেছেন। এইসব নিন্দা করার মধ্যদিয়ে কবি চিত্রিত করেছেন এমন সব নারীকে যারা কেবল ভাবতে শিখেছে যে নারীদেহ মাত্রই পুরুষের ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করার জন্য গঠিত। তাই এদের পতিনিন্দা কোন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। দেহসর্বস্বা রমণ পিয়াসী অতৃপ্ত রমণীর সুন্দর পুরুষের অঙ্ক - শায়িতা হবার কাল্পনিক বিলাপমাত্র। এর দ্বারা সে যুগের কবি কল্পনার বিকাশে যে সমাজ ব্যবস্থা, শাসনযন্ত্র ও শাস্ত্রপুরাণাদির অনুশাসন কাজ করেছে তার সম্যক পরিচয় লাভ করি আর উপলব্ধি করি নারী ছিল বুদ্ধি-হীনা, অবলা, অসহায়া একটা সামাজিক অংশ বিশেষ যার মর্যাদা ভোগ্য ও পণ্য দ্রব্য-সামগ্রীর উর্দ্ধে ছিল না।

৫। মনুসংহিতায় আছে — 'প্রজনার্থং স্ত্রিয়: সৃষ্টা: সন্তানার্থঞ্চ মানবা:'। (নবম স্বর্গ) আরও আছে যে কোন পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান নারী হলে তার পিতার সম্পত্তিতে অধিকার বর্তায় না। সংহিতাকার ও স্মৃতিকারদের বহু উক্তি দিয়ে, আমরা বিস্তার বিশ্লেষণ করেছি আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। এইরূপ শাস্ত্রাদির অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল মধ্যযুগে বেশ কয়েক শতাব্দী ধরেই। ফলে মজ্জাগত হয়েছিল পুরুষ সমাজের প্রতি তাদের আচরণ। পুরুষ সমাজ স্বীয় বাহুবল ও শাস্ত্রানু - মোদিত ধর্মবলে বলীয়ান হয়ে নারী জাতির স্বাতন্ত্র্যকে কোন দিনই স্বীকার করেন নি। ফলে নারী জাতিকে মর্যাদা দেবার মত মানসিকতা

পুরুষ সমাজে গড়ে ওঠেনি। অপরপক্ষে নারী তার আপন ভাগ্যকে পুরুষ ও দেবতা বা বিধাতার উপর ছেড়ে দিয়ে পুরুষ সমাজের গৃহপালিতা নরদেহ-ধারী প্রজা সৃজনের একটি যন্ত্রের মত জীবন যাপন করেছে।

সমগ্র মধ্যযুগ ধরে এদেশে যে রাজনৈতিক উত্থান পতনের ইতিহাস আমাদের সামনে উপস্থিত তাতে করে কোন সাংস্কৃতিক আন্দোলন দানা বাঁধার সুযোগ পায়নি। আদি তান্ত্রিক প্রভাব যুক্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের উপর ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসক কুলের প্রভাব যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তার ফলে হিন্দু সমাজ আপন সমাজকে এক কড়া বাঁধনে সংহত করে রাখার চেষ্টা চালায়। কিন্তু রাজকার্যে মুসলমান শাসক ও কর্মচারী-দের সঙ্গে মেলামেশার সুবাদে দেশে সংস্কৃত শাস্ত্রাদি ও মাতৃভাষায় রচিত ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত গ্রন্থাদির প্রভাব কাটিয়ে সংস্কৃত চর্চার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালী, আরবী ও ফারসী শিক্ষালাভ করতেন। উচ্চ-বর্ণের অত্যাচারের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য অনেক নিম্নবর্ণের বাঙালী হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ফলে হিন্দু-মুসলমান মিশ্র সংস্কৃতির একটা সহাবস্থান বহুদিন ধরে চলে এসেছিল। কিন্তু এই সংস্কৃতির সহা-বস্থান কেবলমাত্র পুরুষ সমাজের মধ্যেই সীমিত ছিল। উভয় সমাজ আপনা-পন নারী সম্পদকে এই পরিবর্তনের আলো থেকে সচেষ্ট ভাবেই আড়ালে রেখেছিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় বাঙালা দেশের তথা সারা ভারতের শাসন ক্ষমতা দখলের একটা সুযোগ

এনে দিলো ইংরাজ বণিক শক্তির হাতে। ক্রমে বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডে রূপান্তরিত হলে খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচার অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো। এই দুই রাজশক্তির ধর্মের মধ্যে শেষ রাজশক্তি খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাবই যে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক।

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকেরাও এদেশে যীশুর সমাচার প্রচারের জন্য আসেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অবশ্য এই মিশনারী কাজের এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু উইলবার ফোর্স ও লর্ড ওয়েলেসলি মিশনের পক্ষে বক্তৃতা করে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনদ মঞ্জুর করার সময় সর্ত দেন যে ভারতে প্রজাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রবর্তন এবং তাদের ধর্ম ও নৈতিক উন্নতির জন্য যে সব ব্যক্তি ভারতে গিয়ে বসবাস করতে ইচ্ছে করেন, আইন দ্বারা তাদের কাজ করার যথোপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধা দিতে হবে। এই সনদ রচিত হয় ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে। এর ফলে মিশনের কাজে কোম্পানী বা স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান সমাজের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ শেষ হয়ে যায়। আর হিন্দু ও মুসলমান সমাজের নিম্নস্তরের মানুষেরা সামাজিক নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এবং ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার সুযোগ নেবার জন্য ধর্মান্তরিত হয়।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ইংরেজ শাসন ও ইংরেজী শিক্ষা

ঘোর তামসিকতাচ্ছন্ন জাতিকে প্রবল ভাবে আঘাত হানে। জাতির প্রাণ মনে বহু যুগের তন্দ্রাচ্ছন্নতা কেটে যায়। বাঙালীর অন্তর্জীবনে এক বিরাট বিপ্লবের সূচনা হয়। এই বৈপ্লবিক জাগরণের মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে জাতি তার আত্মপরিচয় খুঁজে পায়। প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্ধ ধর্মবোধের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করার ক্ষমতা অর্জন করে।

এই আত্মবিস্মৃত জাতির বিদেশী পথ প্রদর্শকদের অবদান স্বীকার করেও যাকে সর্বপ্রথম অর্ঘ্য দিতে হয় তিনি রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। তিনিই সর্বপ্রথম বাস্তবপ্রয়োজন ও যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে প্রচলিত সমাজ শাসন ও শাস্ত্রবিধি অমান্য করার পথ নির্দেশ দেন। শাস্ত্রবিধির শাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা যুক্তি বিজ্ঞানের সাহায্যে রামমোহন যে ভাবে প্রবর্তন করেন তাকে যুগের যুক্তি মন্ত্র বললে অত্যুক্তি হয় না।

রামমোহনই বুঝেছিলেন যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতিকে বাঁচাতে হলে পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন। আর সেজন্য তিনি সব বাধা তুচ্ছ করে সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ, কৌলীন্যপ্রথাজনিত বহুবিবাহ রোধ, ইত্যাদির জন্য আন্দোলন করে নারী জাতির মুক্তি আন্দোলনের জন্য কাজ করে যান। বিলাত গেলে জাত যায় না এটা প্রমাণ করার জন্য তিনি বিলাত যান।

মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের প্রারব্ধ কাজকে আরও এগিয়ে দিয়েছিলেন। রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ব্রহ্মবাদী ছিলেন। একেশ্বরবাদী ছিলেন বলেই হিন্দু পৌত্তলিকদের সঙ্গে তাদের একটা ব্যবধান ছিল। কিন্তু সমাজ সংস্কারের ও স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের জন্য তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়।

এইসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) কথাও স্মরণীয়। তিনি ছিলেন হিন্দু সমাজের প্রগতিশীল নেতাদের অন্যতম। সংস্কৃত শাস্ত্রের অসাধারণ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র গোঁড়া ছিলেন না, কুসংস্কারের দাসত্ব তিনি করেন নি। তিনি প্রাচ্য দর্শনের ব্যবহারিক মূল্যের বিচারে পাশ্চাত্য দর্শনের মূল্য নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন জন্য রাম - মোহন রায় থেকে একটু আলাদা। কিন্তু সতীদাহ, কৌলীন্য প্রথা জনিত বহু বিবাহ প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা ও বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে তাঁর দান অনস্বীকার্য। হিন্দু ব্রাহ্মণের পোশাক পরিচ্ছদ ধারণ করেও আধুনিক যুক্তি বিজ্ঞান ও অন্ধ কুসংস্কার মুক্ত জীবন যাপন করে এবং দেশবাসীর সামনে আদর্শ স্থাপন করে তিনি স্মরণীয় হয়েছেন। নারী মুক্তির জন্য বিদ্যাসাগর অধিকতর স্মরণীয়।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনে ইংরেজ বেথুন সাহেবের নাম

স্মরণীয় । বিদ্যাসাগর বেথুন সাহেবের এই কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে জে, ই, ডি, বেথুন একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বিদ্যাসাগরকে এই প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত করেন । এই দুই ব্যক্তির চেষ্টায় বিভিন্ন জেলায় অনেক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ।

বিধবা বিবাহ আন্দোলন বিদ্যাসাগরকে অধিকতর স্মরণীয় করেছে। স্বদেশীয় লোকদের বহু বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে ঈশ্বরচন্দ্র বিধবা বিবাহ আইন পাশ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন । যদিও এই আইনের বাস্তবায়নের পথে নারীর শত শত শতাব্দীর স্থবির মানসিকতা এবং সমাজ ব্যবস্থা এক পর্বত প্রমাণ বাধা হয়ে আছে আজও ।

কাব্য যুগ পেরিয়ে গদ্য যুগে প্রবেশ কাল থেকে সাহিত্যে সামাজিক প্রতিফলন আরও বিচিত্রতা লাভ করেছে । নবজাগ্রত রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের চেতনা , ধর্মীয় সংস্কার চেতনা , সমস্ত প্রকার শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে আসার জন্য মানসিক সংগ্রামের চেতনার প্রতিফলন হয়েছে সাহিত্যে । কিন্তু ঊষালগ্নে উপন্যাসে ও নাটকে আমরা কিছু নারী চরিত্র অঙ্কিত হতে দেখেছি । তাদের অনেকেই হয়ত কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার ঔপন্যাসিকের মানসলোকবিহারিণী, কিন্তু ঐ মানসলোকবিহারিণীগণ তো সমাজ থেকেই এসেছেন । তাই সে সব সাহিত্যে

বিশেষ করে সামাজিক উপন্যাসে সমাজে নারীর অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র , শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে রোহিনী, কিরণময়ী, সাবিত্রী, সুচরিতা, ললিতারা এই যুগের প্রতিনিধি স্থানীয়া । রোহিনীর দল কিরণময়ী সাবিত্রীতে এসে লড়াই করে হেরে গেছে । কিন্তু সুচরিতা ললিতাতে এসে আপন অধিকার জয় করে নিয়েছে ।

কিন্তু আইন পাশ হয়ে থাকলেও বিধবাদের পুনর্বিবাহের ব্যাপক মানসিকতা তৈরি হয়নি বলে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে । শরৎচন্দ্র সাবিত্রী তার উদাহরণ । তেমনি স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ প্রভৃতির অত্যাচার নিপীড়ণ থেকে মুক্ত হবার জন্য 'হিন্দু কোড' বিল পাশ হয়ে থাকলেও সে আইনের আশ্রয় না নিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে আত্ম-নিধনের পথ গ্রহণ করতে হচ্ছে আজও নারীকে - বর্তমান সংবাদ সাহিত্য তার প্রমাণ, তা প্রতিদিনই আমাদের চিত্ত ভারাক্রান্ত করছে । ক্ষমতা-শালী মধ্যযুগ যেন তার প্রভাবকে অক্ষুন্ন রেখেছে আধুনিক যুগেও ।

যে চিত্র আমরা মধ্যযুগের কাব্য পাঠে পেলাম তা নৈরাশ্য ব্যঞ্জক সন্দেহ নেই । বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রভাব থেকে আপন সমাজ দেহকে রক্ষা করার জন্য স্মৃতি ও পুরাণকারেরা যে বিধি নিষেধ আরোপ করে নারী জীবনকে রুদ্ধ ও অবসন্ন করে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন তার কল্যাণের দিক যদি কিছু থেকেও থাকে তা ব্যর্থ হয়ে

অকল্যাণকেই ডেকে এনেছে। তাই আজও সমাজ নারীকে তার ন্যায্য আসন ও মর্যাদা পুরোপুরি দিতে পারছে না।

কোন কথারই শেষ কথা কেউ বলতে পারে না, তাই কবি Wordsworth অতৃপ্তির সাথে বলেছিলেন --'One word more' রবীন্দ্রনাথ বললেন 'তার শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে ?' আমারও সে দু:সাহস নেই। শেষ যার নেই তার শেষ না বলেই শেষ করলাম।

***
****
***